ATHENA, VOLUME V, JULY 2021 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 135-142
www.athenajournalcbm.in

যমুনা নদীর বিবর্তনের আলোকে গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে ভূ-প্রত্নতত্ত্বের একটি সমীক্ষা

বিশ্বজিৎ রায়*

প্রাপ্ত: ০২/০৬/২০২১ পরিমার্জন: ২২/০৬/২০২১ গৃহীত: ০২/০৭/২০২১

সারসংক্ষেপ: *ভূ-প্রত্নবিদ্যা চর্চার মাধ্যমে একইসাথে ভূমিরূপ বিবর্তন ও সভ্যতার বিবর্তনের যুগপৎ বিশ্লেষণ সম্ভব। গাঙ্গেয় বদ্বীপের মধ্যভাগে প্রবাহিত অধুনালুপ্ত যমুনা বদ্বীপের বিবর্তনে এক উল্লেখযোগ্য অংশ। যমুনা যুক্ত করেছে গঙ্গা ও ইছামতিকে। গাঙ্গেয় বদ্বীপের মধ্যভাগে এই অংশে ভূমিরূপের পরিবর্তন বুঝতে অবলুপ্ত খাতগুলির অনুসন্ধানসহ, এই অঞ্চলে নিবিড় ক্ষেত্রসমীক্ষা তাই একান্তই প্রয়োজনীয়। এই যমুনার ধারে মানসিংহ- প্রতাপাদিত্যের বিভিন্ন সংঘর্ষগুলি ঘটেছে, আবার এই যমুনার ধারে রয়েছে বৈষ্ণব তীর্থ অপরাধভঞ্জন ঘাট। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই যমুনা তীর হয়ে উঠেছে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য ভূমি। সম্প্রতি যমুনা তীরবর্তী অঞ্চল সংস্কারের সময় পাওয়া গেছে কামান সহ বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য। ভূ-প্রত্নতত্ত্বের আলোকে যমুনা অঞ্চলের বিশ্লেষণ তাই গাঙ্গেয় বদ্বীপের বিবর্তন ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির বিশ্লেষণে দিতে পারে এক নতুন দিশা।*

সূচক শব্দ: *ভূ-প্রত্নতত্ত্ব, গাঙ্গেয় বদ্বীপ, অবলুপ্ত খাত, যমুনা, প্রতাপাদিত্য, খাগড়া ঘাটের যুদ্ধ, সলকার যুদ্ধ, অপরাধভঞ্জন ঘাট।*

* সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, পীযুষ কান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার।
e-mail: biswajit.its@gmail.com

ভূমিকা:

বাংলা তথা ভারতের গবেষণাক্ষেত্রে ভূ-প্রত্নতত্ব বা Geo-archaeology এখনো পর্যন্ত স্বল্পালোকিত একটি ক্ষেত্র। এজন্যই প্রত্নতত্ত্ব ও ভূমিরূপবিদ্যার মিলিত জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা, আঞ্চলিক গবেষণাকে বহু দূর অগ্রসর করার পরিকল্পনা থেকে, এখনো আমরা বহুলাংশে বঞ্চিত। অথচ ভূ-প্রত্নবিদ্যা, না তো ভূগোল না তো প্রত্নতত্ত্ব - কারোরই প্রতিস্পর্ধী একটি বিষয় নয়। ভূমিরূপবিদ্যা আলোচনা করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে যুগে যুগে ভূমিরূপের বদলে যাওয়া। ভূমিরূপ বিদ্যা আলোচনা করে নদী অববাহিকা অঞ্চল, জলনির্গম প্রণালীর বিবর্তন। অপরপক্ষে প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে আমরা বহুযুগের বিস্মৃতির আস্তরণ সরিয়ে খুঁজে পাই প্রাচীন সভ্যতার চালচিত্র। প্রত্ন গবেষণার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে দীর্ঘ সময় ধরে বিস্তৃত অঞ্চলে পরিব্যপ্ত সভ্যতার বিবর্তনের রূপরেখা। এই দুই বিষয়ের সম্মিলিত প্রয়োগ রূপে ভূ-প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলন তাই হয়ে উঠতে পারে বিশেষ কার্যকরী একটি জ্ঞানচর্চা পদ্ধতি[১,২]। সমগ্র ভারতেই বিশেষত গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের ভূমিরূপ বদলেছে যুগে যুগে। বদলেছে এর নদী নকশা[৩]। সাথে সাথে বিবর্তিত হয়েছে নদী-নির্ভর সভ্যতার সংস্কৃতি ও অর্থনীতি। প্রাচীন সভ্যতার অনুসন্ধানে এবং ভূমিরূপ বিবর্তনের অন্বেষণে ভূ -প্রত্ন গবেষণার অনুশীলন তাই অতি প্রয়োজনীয়।

ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চল ও প্রস্তাবনা:

বর্তমান প্রবন্ধে, ভূ-প্রত্নতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে গাঙ্গেয় বদ্বীপের মধ্যভাগের প্রাচীন নদী যমুনাকে। ভূমিরূপবিদ্যার দিক থেকে গাঙ্গেয় বদ্বীপের মধ্যভাগের এই নদীর গুরুত্ব এর ব্যতিক্রমী প্রবাহপথে প্রকাশ পায়। এটি ভাগীরথী- হুগলির শাখা রূপে নদীয়া জেলার দক্ষিণ থেকে বেরিয়ে মিশেছে ২৪ পরগনার ইছামতীতে, বয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। মিলন ঘটিয়েছে গাঙ্গেয় বদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তের গঙ্গার সাথে মধ্যভাগ দিয়ে বয়ে চলা ইছামতির। এই অঞ্চল অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রাচীন সভ্যতার ধাত্রীভূমি। অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে মৌর্য-সুঙ্গ যুগে গড়ে ওঠা চন্দ্রকেতুগড়[৪] এবং ব-দ্বীপের মধ্যভাগে, নদীয়া জেলায়, উজ্জ্বল হয়ে ওঠা পাল-সেন যুগের উন্নত সভ্যতা সবই বিকশিত হয়েছে আমাদের আলোচ্য যমুনা নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে ঘিরেই[৫]। এই নদীর গতিপথের বিবর্তন ও সভ্যতার বিবর্তনের তাই যুগপৎ অনুসন্ধান ভূ-প্রত্নতত্ত্বর অন্যতম আকর্ষণীয় কেন্দ্রীয় বিষয়। বর্তমান প্রবন্ধে যমুনা নদীর গতিপথ তথা ভূমিরূপবিদ্যার বিবর্তন যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনি আলোচিত হয়েছে যুগে যুগে যমুনা নদীর পাড় ধরে সভ্যতার বিবর্তন।

ভূ-প্রত্নতত্ত্বের আলোকে যমুনা নদীর বিবর্তন:

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। যমুনা নদীর নদিয়া জেলার হরিণঘাটা অঞ্চলে এক বসত বাড়ির লাগোয়া জমি পরিষ্কার করা হচ্ছিল। যমুনা নদীর পাড় বরাবর মাটি খুঁড়তেই মাটির তলা থেকে উঠে আসে এক বড়োসড়ো কামান। অবশ্য এই প্রথম নয়, এর আগেও যমুনা নদী যা আজকে ছোট ছোট ডোবা আর বুজে যাওয়া খালে পরিণত হয়েছে সেখানে মাটির একশ থেকে দেড়শ ফুট গভীর থেকে মিলেছে বড় নৌকো, বজরার ধ্বংসাবশেষ (বিজরা মৌজা)। নানা সময়ে মিলেছে আরও নানান প্রত্নসামগ্রী[৬]।

যমুনা প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রধান নদী। সেই যমুনা, যা পাল-সেন যুগের বিখ্যাত ত্রিবেণীসঙ্গম এর অন্যতম। 'মনসামঙ্গল' রচয়িতা বিপ্রদাস পিপলাই এর লেখা থেকেও আমরা জানতে পারি সে সময় যমুনা ছিল বিশাল[৭]। এই যমুনা আগে ইছামতি নদীর সাথে মিলিত হয়ে বাদুড়িয়া, বসিরহাট, টাকি, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ সুন্দরবন অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে চলে যেত বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা বাণিজ্যতরীগুলি ইছামতি ও পরে এই যমুনা হয়ে পৌঁছে যেত মধ্য বঙ্গ। এই যমুনা হয়ে প্রাচীন বাণিজ্যতরীগুলি আবার চলত গঙ্গায়। পৌঁছে যেত উত্তরভারতের দিকে। এমনই ছিল এই যমুনার গুরুত্ব। অথচ সামান্য কয়েক শতাব্দি পরে এই যমুনাকে আজকে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর।

কেটে গেছে প্রায় হাজার বছর। বদলেছে মধ্য বঙ্গের এই অংশের নদ-নদী, ভূমিরূপ। বদলেছে বদ্বীপের সামগ্রিক গঠন প্রক্রিয়া[৮]। পুরনো ইতিহাসকে খুঁজে পেতেই তাই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত ক্ষেত্রসমীক্ষার সূত্রপাত নদিয়া জেলার মদনপুর রেলস্টেশনে। মদনপুর রেলস্টেশনের সামান্য কয়েক মিটার দক্ষিণে গেলেই খুবই দুর্বল চেহারায়, অবহেলায় পড়ে থাকা যে ডোবামতো অংশগুলি দেখতে পাব তাই হচ্ছে প্রাচীন গরবিনী স্রোতস্বিনী যমুনা। এরপর মদনপুর রেলস্টেশনের পূর্ব দিকে চলে গেছে সে পূর্ব পাড়ার দিকে, তারপর দক্ষিণ দিকে। এরপর যমুনার যাত্রা বিরহীর মদন গোপালের বিরহ বেদনা লাঘব করে পুনরায় দক্ষিণ দিকে, হরিণঘাটা - নগরউখড়া - গোবরডাঙ্গার মধ্যে দিয়ে ইছামতির কোলে।

গঙ্গা থেকে উৎপত্তি হওয়া এবং ইছামতিতে মিলন- এই গোটা পথের দৈর্ঘ্য ৫০ কিলোমিটারের বেশি। যার মধ্যে চাকদা কল্যাণী থানায় ১১.২৬ কি.মি., গাইঘাটা থানায় ১৪.৪৮ কি.মি., হরিণঘাটা থানা ৩২.১৯ কি.মি., বনগাঁ থানায় ১৬.০৯ কি.মি. এবং হাবরা থানার ৪.৮৩ কি.মি. জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে যাত্রাপথ[৯]। কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রাপথে হাঁটতে হাঁটতে অনেকসময়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না হাজার বছরের প্রাচীন সেই রূপসীকে। হাজার বছরের বদ্বীপ গঠনের নানা পরিবর্তন যমুনার চলার পথকে কোথাও করেছে কচুরিপানা ঘেরা ডোবা, কোথাও করেছে শুকনো নদী খাত যেখানে বছরের দু-এক মাস ছাড়া জল থাকে না। আবার কোথাও তা অবলুপ্ত হয়েছে, পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রধান নদী যমুনা[১০]।

প্রাচীন যমুনা ও মুক্ত তীর্থ ত্রিবেণী:

পাল ও সেন যুগের বিখ্যাত তীর্থকেন্দ্র এবং অর্থনৈতিক বাণিজ্যকেন্দ্র মুক্ততীর্থ ত্রিবেনীর অন্যতম প্রধান নদী ছিল যমুনা। মুক্ততীর্থ ত্রিবেনীর তিনটি ধারা— যমুনা সরস্বতী, ভাগীরথী বা গঙ্গা। তুলনামূলকভাবে ভাগীরথীর থেকে যমুনা-সরস্বতী ছিল অনেক ছড়ানো ও গতিশীল। যমুনার ধারে গড়ে ওঠা ত্রিবেণী ছিল প্রাচীন বঙ্গ তথা ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর[১১]। এমনকি সপ্তগ্রাম বন্দর গড়ে ওঠার আগেও ব্যবসা বাণিজ্য এবং তখনকার দিনে প্রচলিত জলপথ পরিবহনে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল ত্রিবেণী। সপ্তগ্রাম বন্দর গড়ে ওঠার আগেই যে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল ত্রিবেণী তার প্রমাণ আমরা পাই সেন রাজ সভাকবি ধোয়ীর লেখা অমর গ্রন্থ 'পবন দূত' থেকে। জানতে পারি, সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে প্রেমিকার বার্তা নিয়ে পবন দূত সেনরাজধানী বিজয়পুরে আসবার আগে অতিক্রম করে আসেন পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণী (স্তবক ন. ৩২)। পবন দূতের ভাষ্য থেকে আমরা যেমন চিনে নিতে পারি সেনরাজধানী বিজয়পুরের কোলেই ছিল ত্রিবেনীর অবস্থান; তেমনি নিশ্চিত হতে পারি সপ্তগ্রাম বন্দর গঠনের আগেই প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র রূপে বিকশিত হয়েছিল যমুনা বিধৌত এই ত্রিবেণী। এ প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যেতে পারে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর মতামত:

"The wind next has to go to Triveni where the Yamuna issues from the Ganges.. it is to be noted that here we have no mention of the famous port of Saptagrama or Satgaon to which frequent references are met within medieval Bengali works. But we are not sure if the port had risen to eminence during the time of Lakshmansena"[১২].

তারপর কি হলো? সেন রাজধানী বিজয়পুরের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা মুক্ততীর্থ ত্রিবেনীর অন্যতম সম্বল স্রোতস্বিনী যমুনার পরিণতি কি হলো? এরপরে আর কোন খবর জানা যায় কি তার?

অবশ্যই জানা যায়। এই যমুনা নীরব সাক্ষী বাংলায় মোগল বিজয় ও পাঠান বিদায়ের পালাবদলের। এই যমুনা নীরব সাক্ষী বাংলার বীর সন্তান, বারোভূঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর, আকবর ও তার সেনাপতি মানসিংহ পর্যন্ত যার বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই প্রতাপাদিত্যের সংগ্রাম, অবিশ্রান্ত যুদ্ধের আয়োজন সবই গড়ে উঠেছিল যমুনার এই পাড় ঘেঁষে[১৩]।

বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষেত্রসমীক্ষা যে শুকনো মাঠ, নিচু ডোবার পাশ দিয়ে দিয়ে, আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে এই স্থানগুলিতেই ঘটে গেছে বাংলা তথা ভারতের পালাবদলের বিখ্যাত দৃশ্যগুলির। এখানেই কান পেতে থাকলে শুনতে পাওয়া যাবে মানসিংহের সাথে প্রতাপাদিত্যের লড়াইয়ের তলোয়ার, কামানের গর্জন, শোনা যাবে মানসিংহকে সাহায্যের জন্য ভবানন্দ মজুমদারকে সম্মান প্রদর্শন যার মাধ্যমে সূচনা ঘটে নদিয়া রাজবংশের। যমুনার প্রতি বাঁক তাই বাংলার ইতিহাসের অবহেলিত কিন্তু নিরব নিশ্চিৎ সাক্ষী।

মধ্যযুগে যমুনার অবস্থান ও ভূমিকা:

পর্ব ১

প্রতাপাদিত্য ও মোগল সংগ্রামে যমুনা:

ইতিহাস বিখ্যাত বারোভূঁইয়ার অন্যতম প্রধান প্রতাপাদিত্যের রাজ্য, সীমান্ত জড়িয়ে আছে এই যমুনার কূলে। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলার তৎকালীন সুবেদার তা জানতে পেরে দুজন মোগল সেনাপতিকে প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠান। কিন্তু প্রতাপাদিত্য চিনতেন এই বাংলার নদ নদী। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারেনি সেনাপতিরা। জয়যুক্ত হন প্রতাপাদিত্য। রাজা প্রতাপাদিত্যের সাথে অন্যান্য বারোভূঁইয়াদের ঐক্য সম্পাদিত হয়। ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতাপাদিত্য এরপর লুট করেন সপ্তগ্রাম বন্দর। প্রমাদ গোনে দিল্লীর মুঘল দরবার। মুঘল সম্রাট, প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠালেন তার প্রিয় সেনাপতি মানসিংহকে। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহ কাশী থেকে রাজমহল আসলেন। দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে তৈরি হলো সামগ্রিক পরিকল্পনা। ১৬০৩ খ্রি. মানসিংহ এসে দাঁড়ালেন প্রতাপাদিত্যের রাজ্য যশোরের প্রান্তরে।

মানসিংহের শিবির পড়ল বর্তমানের চাকদহ, অতীতের প্রদ্যুম্ন নগরের কাছে আনন্দগঞ্জে। প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা করছিলেন যমুনার অপর পারে। কিন্তু সে রাতেই আরম্ভ হলো প্রবল ঝড়-বৃষ্টি। সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন ভবানন্দ মজুমদার নামের একজন স্থানীয় ভূস্বামী, যিনি পরবর্তীকালে পরিচিত হবেন নদিয়া রাজবংশের স্থপতি হিসেবে। প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটলেও প্রতাপাদিত্যের বীরত্বে মুগ্ধ হলেন মুঘল সেনাপতি। স্বাধীন মুদ্রা, পতাকা ও সার্বভৌমত্ব দাবি ফিরিয়ে নিলেন প্রতাপাদিত্য। ফিরে গেলেন মানসিংহ। অন্যদিকে স্থাপিত হলো নদিয়া রাজবংশ। মানসিংহের এ যাত্রা সম্পর্কে রায় গুনাকর ভারতচন্দ্র বলেন:

> ‘আগে পাছে দুই পাশে দু’সারি লস্কর।
> চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর।।
> মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
> কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া।।’[১৪]

১৬০৮ সালে প্রতাপাদিত্যের প্রতিনিধি হিসাবে শায়খ বারি এবং তার কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্য প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে সুবাদারের দরবারে হাজির হন। চুক্তি অনুসারে, প্রতাপাদিত্যকে সশরীরে হাজির হবার শর্তে রাজপুত্র সংগ্রমাদিত্যকে সুবাদারের জিম্মায় রেখে দেওয়া হয়। ১৬০৯ সালে আত্রাই নদীর তীরে প্রতাপাদিত্য মুঘল সুবাদারের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। প্রতাপাদিত্য এই মর্মে রাজি হন যে তার রাজ্যে ফেরত যাবার পর তিনি ৪০০ যুদ্ধজাহাজ নিয়ে তার কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রাম আদিত্যকে মুঘল সামরিক বাহিনীতে যোগদান করার জন্য প্রেরণ করবেন। এবং তিনি নিজে আড়িয়াল খাঁ নদী ধরে ২০,০০০ পাইক, এক হাজার অশ্বারোহী, এবং ১০০ সামরিক নৌ-যান নিয়ে মুসা খানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবেন। প্রতাপাদিত্য তার প্রতিজ্ঞা না রাখার কারণে, সুবাদার ইসলাম খান তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

সলকার যুদ্ধ:

১৬১১ সালের ডিসেম্বর মাসে মুঘল বাহিনী ইছামতি এবং ভৈরব নদীর তীর ধরে যশোরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকে। দ্রুত তারা যমুনা এবং ইছামতীর সঙ্গমস্থলে সলাকা নামক একটি স্থানে পৌঁছায়। আজও রয়েছে এই জায়গা। আজও আপনি উপস্থিত হতে পারেন সেই স্থানে যেখানে মিশেছিল ইছামতি, মরালি এবং যমুনা। আজও এই বিল 'সাত সলাকির বিল' নামেই পরিচিত[১৫]।

মুঘল বাহিনী সলাকার দিকে অগ্রসর হলে উদিত্য নারায়ণ আচমকা তাদের উপর আক্রমণ করেন। মুঘল বাহিনী কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি আফগান জামাল খানকে দুর্গের দায়িত্বে রেখে যান। যশোর বাহিনী মুঘল বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে। পরে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে যশোর বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। খাজা কামাল নিহত হন। উদিত্য নারায়ণ পলায়ন করেন। জামাল খান তার হস্তীবাহিনী নিয়ে উদিত্য নারায়ণকে অনুসরণ করেন।

খাগড়াঘাটের যুদ্ধ:

"যশোর নগর ধাম/ প্রতাপ আদিত্য নাম/ মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ/ নাহি মানে পাতসায়,/ কেহ নাহি আঁটে তায়/ ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ/ বরপুত্র ভবানীর/ প্রিয়তম পৃথিবীর/বায়ান্ন হাজার যার ঢালী/ ষোড়শ হলকা হাতি/অযুত তুরঙ্গ সাতি/ যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী"[১৬]।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, বৃহত্তর ২৪ পরগনা, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, ভোলা নিয়ে এক বৃহৎ স্বাধীন বঙ্গভূমির বাঙালী রাজা প্রতাপাদিত্য। ১৪ টি তাঁর দুর্গের সংখ্যা, সাতটি তার সুন্দরবন অঞ্চল, তৎকালীন উপকূল জুড়ে - বেহালা, শালিকা, চিৎপুর, মুলাগর, মাতলা এবং তালাতে। সমরশাস্ত্রে পটু কত সেনাদল - অশ্বারোহী, হস্তী আরোহী, পদাতিক, তীরন্দাজ বাহিনী, নৌ বহর, গোলন্দাজ বাহিনী, এক শক্তিশালী সেনা যার বেশিরভাগ আবার বাঙালি কায়স্থ, রাজপুত, মগ ও কুকি সম্প্রদায়ের। সঙ্গে আছে বহু আফগান সেনা এবং দুর্ধর্ষ পর্তুগীজ গোলন্দাজ বাহিনী। সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে তাঁর গুরু কামদেব ব্রহ্মচারী যোগ দেন।

প্রতাপাদিত্য দ্বিতীয়বারের মতো যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এবারের যুদ্ধক্ষেত্র খাগড়াঘাট খাল এবং যমুনার সংগম স্থান। ১৬১২ র জানুয়ারি; মুঘল বাহিনী যশোর বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং তাদের দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থান নিতে বাধ্য করে। যশোর বাহিনী বিপুল গোলাবর্ষণের মাধ্যমে মুঘল বাহিনীর অগ্রগতিকে বাধা দেয়। কিন্তু এক অতর্কিত আক্রমণে মোগলবাহিনী দুর্গ দখল করে নেয়। যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় হয়, কারণ কামদেবের কাছ থেকে মানসিংহ বাংলার পথঘাট, প্রতাপের সামরিক শক্তি এবং তার অবস্থান ইত্যাদি সব জেনে যান। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, কামদেবের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত তখন প্রতাপের একজন বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী হিসেবে কাজ করছিলেন। তারপর যা হবার কথা তাই হল, বাংলার অন্যতম এক স্বাধীন বাঙালী নৃপতির বিদায়। মোগলদের অনুগ্রহে কামদেবের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত এক বৃহৎ ভূখণ্ডের জায়গীরদার হন এবং তাঁর পৌত্র কেশব রায়কে নবাবের পক্ষ থেকে রায় চৌধুরী উপাধি প্রদান করা হয়। যমুনার কূলে ঘেঁষে নির্ধারিত হয়ে যায় প্রতাপাদিত্যের ভাগ্য। মধ্যযুগের এক বিপুল পরিবর্তন ঘটে সেকালের যৌবনবতী যমুনার এই অখ্যাত গ্রামগুলিতে। আজ এদের চিহ্নমাত্র নেই। নেই কোনো স্মারক। নেই কোনো উদ্যোগ। ইতিহাস সংরক্ষণের কোনো চিহ্নমাত্র নেই।

যমুনার পাড় থেকে মাটি খুঁড়ে পাওয়া কামান, আবার সূর্যের আলো দেখলো হয়তো কয়েক শতাব্দি পরে। এই কামান হয়তো সেদিন অগ্নি বর্ষণ করেছিল প্রতাপাদিত্যের সাথে মানসিংহের লড়াইয়ে। অথচ কী করুণ পরিণতি আজ এই যমুনার। সামগ্রিকভাবেই বদ্বীপ গঠনের বিবর্তনের সাথে সাথে মধ্য বঙ্গের এই অংশের নদনদী, জলনির্গম বদলেছে দ্রুতগতিতে। বদলেছে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস, একই সাথে বদলেছে বাঙালি জাতির ইতিহাস[১৭,১৮]। আজ যেখানে গঙ্গা প্রবাহিত, আজ থেকে এক হাজার বছর আগে গঙ্গা নদীয়া জেলার পূর্ব দিক দিয়ে বইতো। বর্তমানের বীরনগর, প্রাচীন উলা গ্রামের, পাশ দিয়ে , রানাঘাট থানার আনুলিয়া অঞ্চল দিয়ে, বইতো বর্তমান চাকদহ স্টেশনের পাশ দিয়ে শিমুরালি, মদনপুরের পশ্চিম

দিক দিয়ে। অতীতে যা ছিল সক্রিয় বদ্বীপের অংশ কালের নিয়মে সেখানে জোয়ার ভাটা বন্ধ হয়েছে, বন্ধ হয়েছে পলি জমা, নদীর গতিপথ বদলে গঙ্গা সরে গেছে আরও পশ্চিম দিকে। যমুনার সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যমুনা ক্রমশ প্রবীণা হয়েছে[১৯]।

পর্ব-২

লোকায়ত সংস্কৃতি কেন্দ্র রূপে যমুনা সংলগ্ন অঞ্চলের ভূমিকা:

আজ হরিণঘাটা হয়ে চলার পথে পড়ে চাঁদমারি বয়সার বিল, কুলিয়া ও মথুরা বিল। এগুলি প্রকৃতপক্ষে সেই প্রাচীন যমুনার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেহের ভাঁজগুলি। যমুনার খোঁজে খোঁজে আপনি চলে আসুন চান্দামারী বয়সারবিল এর পশ্চিম দিকে, দেখবেন প্রায় ১৫ কিমি লম্বা এক খাল ভাগীরথীর সাথে যুক্ত। এখানেই কাটান বসন্তের একটা গোটা দিন, আস্ত একটা রাত। কাটান চান্দামারী, মুরাতিপুর, সীমান্ত, কাঠালতলা গ্রামের মানুষ গুলির অতিথি হয়ে। বড় আন্তরিক এদের মেশা, এদের যাপন। চাষের কাজ, সেচের জল আজও এই যমুনা নদী নির্ভর। গ্রামের প্রাচীন মানুষদের গল্পকথায় এখনো যৌবনের যমুনার প্রাণের স্পর্শ পাবেন। বড়বিল থেকে আপনি চলে আসুন গয়েশপুর পৌরসভার কুলিয়া বিলে, প্রায় ৩০ একর জায়গাজুড়ে। যদিও 'বিশেষজ্ঞদের' মতামত নিয়ে তৈরি করা এই বিলের মাঝখান বরাবর চলে গেছে পিচের কালো রাস্তা। ধ্বংস করেছে এই জলাশয় এর জৈব-বৈচিত্র্য, যা খুবই দুঃখজনক। বৈষ্ণবদের ঐতিহাসিক তীর্থক্ষেত্র যমুনার কূলে এই অখ্যাত গ্রাম। এখানেই নাকি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে শেষবার সাক্ষাৎ হয় শ্রীচৈতন্যদেবের। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য দেব অবতরণ করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলের যাত্রাপথ ছিল আমাদের আলোচ্য যমুনা নদীই। যমুনা নদী পথের এই যে ঘাটে তিনি অবতরণ করেছিলেন সেই স্থান পরম বৈষ্ণবতীর্থ কুলিয়ার ঘাট তথা 'অপরাধভঞ্জন ঘাট'। কুলিয়া শ্রীপাটের অপরাধভঞ্জনের মেলা সম্পর্কে 'নদীয়া কাহিনী' তে কুমুদনাথ মল্লিক বলছেন:

"শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীনরহরি দাসের নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি, বৈষ্ণবচূড়ামণি প্রেমদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্ত্তাগণের বিরচিত পদসমূহ ও অন্যান্য বহু প্রামাণিক গ্রন্থরাজি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যে কুলিয়া গ্রামে পতিতপাবনাবতার শ্রীমদেগৌরাঙ্গ প্রভু অধ্যাপক চাপাল গোপালকে 'শ্রীবাস-অপরাধ' হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, যে স্থানে শ্রীপ্রভু ভাগবতবেত্তা মায়াবাদী পন্ডিত দেবানন্দের ভক্তাপরাধ মার্জ্জনাপূর্ব্বক বর দিয়াছিলেন এবং যে স্থানে কৃষ্ণানন্দ নামক তন্ত্রবিৎ কোন পন্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহারোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন..."[২০]

নদিয়া জেলা বৈষ্ণব সাধনার, রাধাকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্য বর্ণনার পীঠস্থান। যমুনার কূল ঘেঁষা এ মাটি শতাব্দীর পর শতাব্দী সাক্ষী থেকেছে নানা সাংস্কৃতিক জনবিবর্তনের। যমুনার পারে এলে আপনি তাই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন, কৃষ্ণ ও রাধা যেমন হয়েছেন ঘরের ছেলে ও মেয়ে, যত সহজে কৃষ্ণকে মায়েরা সন্তানের অপত্যে গ্রহণ করেছেন, বৈষ্ণব তত্ত্বের অপ্রাকৃত লীলা তত সহজে আপামর মানুষের মনের দখল কিন্তু নিতে পারেনি। আরো বহু স্থানের মতো নদিয়াতে কৃষ্ণ-রাধা ভগবানের স্তর ছাড়িয়ে তাই হয়ে উঠেছেন ঘরের আদরের ধন। লোকসংস্কৃতিতে তাই ঘরের দুষ্টু ছেলে কৃষ্ণ আর রাধা মা অনায়াসে ঠাঁই করে নিয়েছে-বৈষ্ণব তত্ত্ব, গুহ্য সাধনা ও তত্ত্বের চৌকাঠ পেরিয়েই।

এ প্রসঙ্গে 'নদীয়া জেলা সংস্কৃতি পরিচয়' গ্রন্থে সুধীর চক্রবর্তী লিখছেন—

"বৈষ্ণব ধর্মের উদার উন্মুক্ততার সার্বজনীন প্রভাব বাংলার অনুন্নত অবজ্ঞাত লোকগোষ্ঠির জীবনে সুদুরপ্রসারি হয়। সাধারণ মানুষের জীবনে চৈতন্যদেব হয়ে ওঠেন মুক্তিদূত। নানা ছোটছোট সম্প্রদায়ের বিচিত্র বিশ্বাস ও আচার ধীরে ধীরে বৈষ্ণবধর্মে যুক্ত হয়ে যায়। এই সার্বিক মিশ্রণের উন্মাদনায় বৈষ্ণবধর্মে তন্ত্রসাধনা, বিকৃত বৌদ্ধবাদ, নাথপন্থী গুরুবাদ ও সহজিয়া ধর্মের যৌন যোগাচার সবই একাকার হয়ে যায়। বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা এভাবে

লোকধর্মে স্বতন্ত্র পথচারী করল"[২১]।

নদিয়ার মাটি তাই প্রিয়রে দেবতা করার, দেবতারে প্রিয়। এখানে দানবদলনীকে যেমন ঘরের মেয়ে বানানো যায়, ভগবানকে তেমনই বানানো যায় ভাই। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্ত্রী তাই কৃষ্ণকে অনায়াসে দেন ভাইফোটা। তার সাথে মিশে যায় গরু চরানো রাখাল বালক সহ সে যুগের সমাজ-অর্থনীতি। মিশে যায় সেই সময়কার যাপন। অনুধাবন করা যায়, ধর্মবিশ্বাসের মূলে একদিকে যদি থাকে ভালোবাসা অন্যদিকে আছে অনিশ্চয়তার চিন্তাভাবনা। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা থেকে মুক্তির বাসনা, মানুষের জান্তব প্রবৃত্তির দুর্বলতা (inherent weakness)।

যুগে যুগে বারবার গতিপথ বদল করেছে চঞ্চলা যৌবনবতী যমুনা এবং এই যমুনাকে কেন্দ্র করেই মধ্য বঙ্গের জলনির্গম এবং বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয়েছে যুগে যুগে[২২]। ভূমিরূপ গঠন এর সীমানা নির্দেশক হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে যমুনাকে। ১৭৬৪ সালে যখন আঁকা হল রেনেলের ম্যাপ, তখনো সে যমুনা এখনকার মতন কচুরিপানাঘেরা দুর্বল, শীর্ণ নয়। এমনকি ভাবতে অবাক লাগে ১৮১০ সালের সরকারী সার্ভেতে এই যমুনা নদী ও বাগের খালকেই সুন্দরবনের উত্তর সীমান্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছিল[২৩]। অর্থাৎ তখন এই অঞ্চলগুলি ছিল সরকারিভাবেই সুন্দরবনের অংশ। অবশ্য কাঁচরাপাড়ায় আজও প্রচলিত বনবিবির থানে গেলে সে স্মৃতি উঁকি দেয় বৈকি।

উপসংহার:

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা থেকে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে মধ্য বঙ্গের ভূমিরূপ বিবর্তনের ক্ষেত্রে যমুনা নদীর বিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে আদি ঐতিহাসিক কাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সভ্যতার ওঠাপড়ার সাক্ষী এই যমুনা নদীর দুই পাড়। ভু-প্রত্নবিদ্যার নিবিড় অনুশীলন এই অঞ্চলে তাই অত্যন্ত প্রয়োজন , যা আমাদের আজ পর্যন্ত গাঙ্গেয় বদ্বীপের ভূমিরূপ ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অনেক অন্ধকারময় দিককে আলোয় উপস্থিত করতে পারে। যদিও যমুনার পাড় ঘেঁষে তৈরি হয়েছে নদী গবেষণা কেন্দ্র (River Research Institute), কিন্তু মধ্যবঙ্গের ক্রমাগত বদলে যাওয়া বদ্বীপ আর বদলে যাওয়া নদীগুলিকে নিয়ে হয়নি কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা। Palaeochannel analysis ও Geo-archaeology নিয়ে নেই কোনো গবেষণা। খুঁজে পাওয়া পুরাবস্তুগুলি নিয়ে গড়ে ওঠেনি কোন সংগ্রহশালা। স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন মনে জাগে—বাঙালি কি সত্যি আত্মবিস্মৃত জাতি নয়?

সূত্র নির্দেশ:

১) Robins, R.P. (1993). 'Archaeology and the Currawinya Lakes: Towards an Arid Lands of Southwest Queensland' Griffith University. Brisbane.

২) Thorby, R.B. (1998). 'Shifting Location, Shifting Scale: Regional Landscape Approach to the Prehistoric, Archaeology of the Palmer River Catchment,' Central Australia Northern Territory University, Darwin.

৩) Bagchi, Kanan Gopal, (1944). 'The Ganges Delta'. University of Calcutta, Calcutta.

৪) 'Chandraketugarh-Rediscovering a Missing Link in Indian History', (2013), A synoptic Collection of Three Research by the Sandhi Group, IIT, Kharagpur.

৫) Adhikary Banerjee, Dr. Keka, (2018). 'Debagram: A new destination is the archaeotourist Map of West Bengal', *Monthly Bulletin,* July, Vol. XLVII No.07, The Asiatic Society, Kolkata, p. 09.

৬) দাস, সুনীল চন্দ্র, (১৯৯৫), *কাঁদে মরালি কাঁদে যমুনা,* লঘুছন্দা প্রকাশনী, চাকদহ, নদিয়া।

৭) বিশ্বাস, অচিন্ত্য, (২০০১), *বিপ্রদাস পিপিলাই এর মনসামঙ্গল,* (সম্পা.), রত্নাবলী, কলিকাতা।

৮) দাস, রমেন্দ্রকুমার ও মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, (১৯৯৭), *ভূমিরূপ' উদ্ভব ও প্রকৃতি,* পশ্চিবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

৯) দাস, সুনীল চন্দ্র, (১৯৯৫), *পূর্বোক্ত*।

১০) Chakraborty, Dilip Kumar, (2001). *Archaeological Geography of the Ganga Plain, The Lower and Middle Ganga,* Permanent Black, Delhi.

১১) রায়, অনিরুদ্ধ, (১৯৯৯), *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর,* আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা।

১২) চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ, (১৯২৬), *পবনদূতম,* সাহিত্য পরিষৎ সিরিজ: সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা। পৃ. ২৫।

১৩) মিত্র, সতীশ চন্দ্র, (১৯৬৫), *যশোহর খুলনার ইতিহাস (২য় খন্ড),* (সম্পা.), মিত্র শিবশঙ্কর, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

১৪) চক্রবর্ত্তী, শ্রীনটবর (১৩১২), *ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী,* (সম্পা.), কলিকাতা, পৃ. ৩৮৩।

১৫) দাস, সুনীল চন্দ্র, (১৯৯৫), *পূর্বোক্ত*।

১৬) চক্রবর্ত্তী, শ্রীনটবর, (১৩১২), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২১৮।

১৭) Majumder, Ramesh C. (1971). *History of Ancient Bengal*, G. Bharadwaj, Calcutta.

১৮) রায়, নীহাররঞ্জন, (১৯৮০), *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব),* পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, পৃ. ৪৯০।

১৯) দাস, সুনীল চন্দ্র, (১৯৯৫), *পূর্বোক্ত*।

২০) মল্লিক, কুমুদনাথ, (১৯১০), *নদীয়া কাহিনী,* সাহিত্য সভা, কলিকাতা, পৃ. ২৫৫।

২১) চক্রবর্তী, সুধীর, 'লোকধর্ম' , (২০০৩), *জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ নদিয়া,* (সম্পা.), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৪০।

২২) রায়, প্রীতিতোষ, (২০১২), *বাংলার হারানো নদীর ইতিকথা,* (আদিগঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা, বিদ্যাধরী), কোডেক্স, কলকাতা।

২৩) মল্লিক, কুমুদনাথ, (১৯১০), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৫৩।